[ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ- إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَي بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوُا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا-

[illegible] ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্য তোমরা ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। তাতে যদি তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের চাইতে তাদের অধিকতর শুভাকাংখী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে মনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত’ (নিসা ১৩৫)।

[illegible] অত্র আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা ইনছাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপরে অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্য দান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুনিয়াতে নবী প্রেরণ ও ঐশী কিতাবসমূহ নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হ’ল মানব সমাজকে ন্যায় ও ইনছাফের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ‘আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহকারে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে’ (হাদীদ ২৫)। এখানে ন্যায়নীতির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ‘মীযান’ শব্দটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নইলে একমাত্র কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, যার মধ্যেই ন্যায়নীতি বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাব ভিত্তিক ন্যায়নীতিই হ’ল প্রকৃত ন্যায়নীতি এবং তা প্রতিষ্ঠা করাই হ’ল মুমিনের প্রধান কর্তব্য। মানুষের মনগড়া আইন প্রকৃত ন্যায়নীতির মানদন্ড নয়। আয়াতে ‘ধনী ও গরীবের’ কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যাতে এর দ্বারা ন্যায়বিচার প্রভাবিত না হয়। অতঃপর ‘ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলা এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, ক্ষমতাশালীরা সর্বদা নিজেদের দলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির ফলে কৃত বে-ইনছাফীর কথা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু আল্লাহর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। আল্লাহ সেকথা পরিষ্কারভাবে বান্দাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আল্লাহ পাক দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এক- আত্মীয়তা এবং দুই- দলীয়তা। আত্মীয়তার বিষয়টি সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দলীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ সূরা মায়েদায় বলেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى اَلاَ تَعْدِلُوْ اِعْدِلُوْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাক এবং কোন দলের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর। এটাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় তৎপরতা সম্পর্কে জ্ঞাত' (মায়েদাহ ৫/৮)।

লক্ষণীয় যে, সূরা নিসায় القسط বা ইনছাফকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এই ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, আত্মীয়তা রক্ষাও তো আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। তার প্রতিবাদে القسط বা ইনছাফকে আগে এনে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়বিচারের বিপক্ষে আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা কখনোই আল্লাহর জন্য হ'তে পারে না। অন্যদিকে সূরা মায়েদায় শত্রুপক্ষের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لله অর্থাৎ 'আল্লাহর জন্য' কথাটি আগে আনা হয়েছে। এর দ্বারা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ থাকার স্বভাবগত ভাবাবেগ থেকে সংযত থাকতে বলা হয়েছে এবং বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর জন্য দন্ডায়মান হয়েছ। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং শত্রুপক্ষের সাথে ন্যায়বিচার কর। মোটকথা আলোচ্য সূরা নিসা ও একই মর্মের সূরা মায়েদায় বর্ণিত আয়াত দু'টির মর্মকথা হ'ল (১) আত্মীয়-অনাত্মীয় বা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়নীতি ও সুবিচারে অটল থাকা এবং (২) আল্লাহর জন্য সত্য সাক্ষ্য দেওয়া, যাতে সুবিচার সম্ভব হয়।

উপরে বর্ণিত দু'টি প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ আত্মীয়তা ও দলীয়তা হ'তে মুক্ত হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তারা পরস্পরে যেমন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, তেমনি আত্মরক্ষার তাকীদে কিংবা নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য হাছিলে দল গঠন করাও তার স্বভাবজাত। এ দু'টির ভাল দিককে ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করেছে। কিন্তু খারাপ দিককে নিন্দা করেছে। যেমন- বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে ইসলাম কবুল না করা (বাক্বারাহ ২/১৭০) ও দলের দোহাই দিয়ে সত্যকে চিনে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (বাক্বারাহ ১৪৬)। ইহুদী-নাছারারা ইসলামের সত্য বুঝেও তা কবুল করেনি। অন্যদিকে আল্লাহ আত্মীয়তার বন্ধনকে সর্বদা মযবুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তা আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘণ করে (ইসরা ২৬)। একইভাবে তিনি দলীয় পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখার অনুমোদন দিয়েছেন যতক্ষণ তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যেমন আনছার ও মুহাজির নামের দলীয় পরিচয় আল্লাহ স্বয়ং কুরআনেই উল্লেখ্য করে তাদের প্রশংসা করেছেন (তওবাহ ১০০)। আত্মীয়তা রক্ষা করা ও দলীয়তা বজায় রাখা তখনই নিষিদ্ধ হবে, যখন তা স্রেফ দুনিয়াবী কোন হীন স্বার্থে হবে এবং তার লক্ষ্য 'হাবালুল্লাহ'কে বাদ দিয়ে 'হাবলুশ শয়তান'-কে আঁকড়ে ধরা হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহকে) সকলে সমবেতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' (আলে ইমরান ১০৩)। পরের আয়াতে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, وَلاَ تَكُوْنُوْا

كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ‘আর তোমরা তাদের মত (অর্থাৎ ইহুদী-নাছারাদের মত) হয়োনা। যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ এসে যাওয়ার পরেও মতবিরোধ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব’ (আলে ইমরান ১০৫)। তার পূর্বে আল্লাহ বলে দিয়েছেন يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথাযোগ্য ভয়’ (আলে ইমরান ১০২)।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, জাতীয় ও সমষ্টিগত উন্নতি নির্ভর করছে দু’টি বিষয়ের উপরে (১) আল্লাহভীতি (২) সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারন করা। প্রথমটি না থাকলে মানুষ দুর্নীতিবাজ হবে এবং দ্বিতীয়টি না থাকলে সামাজিক ঐক্য ও ন্যায়নীতি বিনষ্ট হবে। অত্র আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখনই কোন দল বা সংগঠন হাবলুল্লাহকে বাদ দিয়ে স্রেফ ব্যক্তি পূজা ও অনৈসলামী আদর্শ পূজায় লিপ্ত হবে, সেই দল বা সংগঠন থেকে ঈমানদার ব্যক্তিকে বেরিয়ে আসতে হবে। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে উক্ত দু’টি দোষ অর্থাৎ দলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি বর্তমান ছিল। যা উপরোক্ত দু’টি ঔষধ অর্থাৎ তাক্বওয়া ও হাবলুল্লাহ প্রয়োগের মাধ্যমে দূরীভূত হয় এবং সেই পতিত সমাজের লোকগুলি দুনিয়ার সেরা মানুষে পরিণত হয়। বাংলাদেশের বর্তমান পতিত সমাজকে উন্নত করতে গেলে ঐ একই ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, অন্য কিছুই নয়।

বস্ত্ততঃ আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) হ’তে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রাসূল এবং শতাধিক ছহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানব সমাজে ইনছাফ ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা। নৈতিক উপদেশ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে ন্যায় ও ইনছাফের পথে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যারা অবাধ্যতা করেছে, তাদেরকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ন্যায়ের পথে ফিরে আসতে বাধ্য করার কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সরকার ও জনগণ সবাইকে ন্যায় ও ইনছাফের উপরে দৃঢ় থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

????? ????????? ? ??????????

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা আল্লাহর জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক’। সাক্ষ্যের অপর দিক হ’ল, সুফারিশ করা। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য ও সুফারিশ থাকলে তার পরকালীন ছওয়াব অত্যধিক। আর বিপরীত হ’লে তার মন্দ পরিণতিও ভয়ংকর। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ‘যে ব্যক্তি কারু জন্য উত্তম সুফারিশ করবে, তা থেকে সে একটি অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ সুফারিশ করবে, তা থেকেও সে

একটি অংশ পাবে' (নিসা ৮৫)। আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর প্রদান, আইনজীবীদের বাদী ও বিবাদী পক্ষ সমর্থন, নেতৃত্ব নির্বাচন সবই উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত। যদি কেউ জেনেশুনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় নম্বর দেয় এবং কোন উকিল যদি স্রেফ পেশার দোহাই পেড়ে জেনে শুনে মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে, তবে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহগার হবে।

অনুরূপভাবে জেনেশুনে অযোগ্য নেতা নির্বাচনে সমর্থন দিলে ঐ ব্যক্তি ঐ নেতার যাবতীয় দুষ্কর্মের ভাগীদার হিসাবে গন্য হবে। আদালতের সাক্ষ্য দানের ফলাফল সীমিত সংখ্যক লোকের উপরে বর্তায়। কিন্তু নেতৃত্ব নির্বাচনে সাক্ষ্য বা সমর্থন দানের তিনটি দিক রয়েছে। (১) সাক্ষ্য দান করা (২) ব্যক্তিগত সুফারিশ করা (৩) সামষ্টিক অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে নেতা হ'লেন সমষ্টির দায়িত্ব প্রাপ্ত। এই তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্বকে সমর্থন দিলে নেতার যাবতীয় নেকীর কাজের ছওয়াবের একটা অংশ যেমন সমর্থনদাতা পাবেন, তেমনি বিপরীতটা হ'লে তার মারাত্মক ফলাফলও সমর্থনদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। কারণ নেতার সঠিক বা বেঠিক সিদ্ধান্তের ফলাফল সমস্ত সমাজের উপরে পড়ে। সেকারণ ইসলামে নেতৃত্ব গ্রহণ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং লোকদের নিকটে কর্তৃত্ব চাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিনা চাওয়ায় আল্লাহর পক্ষ হ'তে পূর্বতন নেতার মাধ্যমে বা জনগণের মাধ্যমে যদি নেতৃত্ব এসে যায়, তবে তার যথাযথ হক আদায়ের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। না চেয়ে পাওয়াতে আল্লাহ বরকত দেন। আর চেয়ে নিলে তাতে আল্লাহর রহমত চলে যায়। আধুনিক গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি সমাজকে যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে দলীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে এতই নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে গেছে যে, মানুষ তাকিয়ে থাকে কখন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে। অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা এবং সন্দেহভাজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে 'হাজত'-এর নামে কারাবন্দী রাখার ও নির্যাতন করার যে নোংরা দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরাজ করছে, তার বিপরীতে ইসলামের সহজ-সরল প্রত্যক্ষ বিচার পদ্ধতি কতইনা সুন্দর। আজও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে তার কিছুটা হ'লেও বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যা ঈর্ষণীয় বৈ-কি!

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যাকেই তার বিরোধী ভাবত তাকেই হাজতের নামে কারাবন্দী করে রাখত বছরের পর বছর এবং ইচ্ছামত নির্যাতন করত। যাতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠন অব্যাহত থাকে। কিন্তু আজ স্বাধীন দেশের 'জনগণের সরকার' নিজ জনগণকেই শত্রু ভেবে তাদের উপর ফেলে আসা সেই বৃটিশ আইনের বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ৫৪ ধারা নামক যুলুমের ধারাটিকে প্রত্যেক দলীয় সরকার তার সম্ভাব্য বিরোধীদের দমনে ব্যবহার করছে, যা নিঃসন্দেহে মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘণ। বর্তমানে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে অন্যদের তদন্তাধীন বিভিন্ন মামলায় টার্গেটকৃত ব্যক্তির নাম জুড়ে দিয়ে বিচারের নামে কারাবন্দী রেখে নির্যাতন করার নতুন ধারা শুরু হয়েছে, যা আরও মর্মান্তিক। আমেরিকার মত সেরা গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারবাদী রাষ্ট্র শত শত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে বিভিন্ন কারাগারে বছরের পর বছর ধরে যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দেখাদেখি তাদের লেজুড় রাষ্ট্র ও সরকারগুলি স্ব স্ব নাগরিকদের উপরে একই প্রক্রিয়া চালু রেখেছে। বছরের পর বছর হাজত খেটে যখন কোন ব্যক্তি 'বেকছূর খালাস' পেয়ে

বেরিয়ে আসে, তখন তার হারানো জীবন ফিরিয়ে দেবার কোন পথ আর থাকে না। এজন্য জনগণের নির্বাচিত সরকার সামান্য ‘দুঃখ’ পর্যন্ত প্রকাশ করে না। মযলূম মানবতার দীর্ঘশ্বাসে এভাবেই ভারি হচ্ছে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস।

মার্কিন গণতন্ত্রের মুখোশ তার জনগণের কাছে ইতিমধ্যে খুলে গেছে। তাই দেখা যায় সেখানকার শতকরা পঞ্চাশভাগ ভোটারও এখন ভোটদান করে না। সেখানে আজও ১৫% লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। অথচ ওমর (রাঃ)-এর ইসলামী খেলাফত কালে অর্থনৈতিক অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, সারা দেশে একজন যাকাত নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের যাকাত নিতে গিয়ে পদপিষ্ঠ হয়ে কত গরীবের জীবন চলে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশ ছলে-বলে-কৌশলে এবং ওসামা বিন লাদেনের মিথ্যা টেপ বাজিয়ে জুজুর ভয় দেখিয়ে এক-চতুর্থাংশ মার্কিনীদের ভোট নিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। ‘গণতন্ত্রের লালনভুমি’ গ্রেট বৃটেন যুগযুগ ধরে একজন রানীকে লালন করে যাচ্ছে সরকারী খরচে। দেশের সংসদে কোরাম সংকট এড়ানোর জন্য আইন করা হয়েছে সদস্যরা সংসদ চলাকালীন সময়ে লন্ডন শহরে উপস্থিত থাকলেই চলবে। এভাবে একদিকে যেমন সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার চলছে। অন্যদিকে তেমনি সংখ্যালঘু দলের উত্তম পরামর্শকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এভাবেই চলছে আধুনিক গণতন্ত্রের কথিত জনগণের শাসন। প্রশ্ন দাঁড়ায়, বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ও দলীয় শাসন ব্যবস্থায় কি সত্যিকারের ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব? এর মাধ্যমে কি সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব? এককথায় এর দ্বিধাহীন জবাব হ’ল- না, কখনোই না। এর প্রধান কারণ বস্তুবাদী দলীয় সরকারের অধীনে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজদেহের সর্বত্র দলীয়তার ক্যান্সার বাসা বাঁধে। যা পূরা সমাজকে বিষাক্ত ও জর্জরিত করে। বিশেষ করে শিক্ষা ও প্রশাসন দু’টি প্রধান ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দলীয়তার বিষে আক্রান্ত হওয়ায় এবং সর্বত্র সততা ও মেধার সংকট দেখা দেওয়ায় জাতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। অথচ দলনেতারা ভাবেন না যে, এর মাধ্যমে তারা সাময়িক লাভবান হ’লেও দেশের ও জাতির স্থায়ী ক্ষতি করে যাচ্ছেন। তাছাড়া আজকে যিনি দলে আছেন, কাল তিনি শত্রু হ’তেও তো পারেন। আলোচ্য আয়াতে উক্ত বিষয়ে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে বিষয়টি, তা হ’ল ইনছাফ প্রতিষ্ঠা। ইনছাফ ও ন্যায়বিচার হ’ল শামিতর চাবিকাঠি। ইনছাফ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সরকার ও জনগণ উভয়ের। এমনকি পারিবারিক জীবনে যদি ইনছাফ না থাকে, তাহ’লে সেখানেও অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। আজকের বিশ্বে ব্যাপক হিংসা ও হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল ইনছাফ না থাকা□ No Justice no Peace ‘ন্যায়বিচার নেই তো

শান্তি নেই’। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সরকারী ও বিরোধী দলের সোচ্চার থাকায় সেখানে সর্বদা সর্বত্র মারমুখো পরিস্থিতি বিরাজ করে। সেকারণ সে সমাজে সঠিক অর্থে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। ফলে নিরপরাধ মানুষ নির্যাতিত হয়। মানুষ হক কথা বলতে ভীত হয়। সম্মানিত ব্যক্তি অসম্মানিত হয়। গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে যে চরমপন্থার উত্থান ঘটেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার ও অবিচার। ন্যায় ও সুবিচার হ’ল শান্তি ও সুখের চাবিকাঠি। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষ আজ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে। মহাসাগরে ডুব দিয়ে মুক্তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু নিজের গৃহকোণে এক টুকরো সুখের প্রলেপ সে খুঁজে পায় না। পরস্পরে বিশ্বাস ও ন্যায়নীতি থাকলে কুঁড়ে ঘরেও শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু তা-না থাকলে সুউচ্চ বালাখানা অগ্নিগৃহে পরিণত হয়। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্ত্তবাদী বিশ্বব্যবস্থা মানুষকে বিলাস সামগ্রী উপহার দিয়েছে। কিন্তু শান্তি ও সুখ দিতে পারেনি। কারণ সর্বত্র অন্যায় ও বে-ইনছাফীর জয়জয়কার। সর্বত্র ধর্মহীনতার সয়লাব।

????? ?????????? ?????

আলোচ্য আয়াতেই ইনছাফ প্রতিষ্ঠার উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। সেটা হ’ল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। যার অর্থ কেবল মনে মনে আল্লাহকে ভয় করা নয়, বরং তার অর্থ হ’ল আল্লাহর দেখানো পথে চলা এবং জীবনের সব স্তরে অহি-র বিধান অনুসরণ করা। আবু হাজল সহ জাহেলী আরবের ১৫ জন নেতা একত্রে এসে একদিন রাসূলকে তার দাওয়াত পরিত্যাগের বিনিময়ে আরবের নেতৃত্ব, অঢেল ধন-সম্পদ ইত্যাদি দেওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এতকিছু না করে তোমরা যদি কেবল একটা কলেমা পড়, তাহ’লেই আরব-আজমের নেতৃত্ব ও অঢেল ধন-সম্পদ তোমাদের পায়ের তলে লুটাবে’। আবু জাহ্ল খুশীতে বলে উঠল, এমন হ’লে একটা কেন দশটা কলেমা পড়তে রাযী আছি’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা পড় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। আবু জাহ্ল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, ‘সব ইলাহ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র একজন ইলাহ। এতো বড় বিস্ময়কর কথা’ (ছোয়াদ ৫)। আবু জাহল আল্লাহকে মান্ত ও তাঁকে ভয় করত। তা সত্ত্বেও কলেমা পাঠ করেনি। কারণ সে এর গুঢ় তত্ত্ব বুঝত যে, একক আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করলে তাঁর বিধান মেনে চলতে হয় এবং নিজেদের মনগড়া বিধান যা দিয়ে মানুষকে গোলাম বানানো যায়, শোষণ করা যায়, তা আর চালানো যাবে না। বস্ত্ততঃ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল মানবাধিকার নিশ্চিত হয় এবং মানব সমাজে সত্যিকারের ইনছাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্বের মধ্যেই মানুষ তার প্রকৃত স্বাধীনতা খুঁজে পায়। একেই বলে তাওহীদ।

যুগে যুগে নবীগণ মানুষকে তাওহীদের এ দাওয়াতই দিয়ে গেছেন। আর সেজন্যেই প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাগণ কখনোই নবীগণের এ দাওয়াতকে মেনে নেয়নি। নবীগণ শত নির্যাতন সহ্য করেও শিরকের সাথে আপোষ করেননি। বরং কারাগার ও শাহাদতকে বরণ করেছেন হাসিমুখে। আর এই আপোষহীনতাই ছিল তাঁদের ‘জিহাদ’। নবীদের মিশনকে তাই এককথায় বলা হয়- দাওয়াত ও জিহাদ। যার মধ্যেই রয়েছে মযলূম মানবতার সত্যিকারের মুক্তির পথ। আজও প্রকৃত মানব দরদী তিনিই হবেন, যিনি সমস্ত দুনিয়াবী

লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে তাওহীদের পথে দাওয়াত দিবেন এবং এ পথে প্রাপ্ত নির্যাতনকে আশীর্বাদ হিসাবে বরণ করে নিবেন। দুনিয়াতে কিছু না পাওয়ার বিনিময়ে আখেরাতে তার জন্য জান্নাতের ফুলশয্যা অপেক্ষা করছে। দুনিয়াপূজারী আরবরা যখনই নিজেদের বানোয়াট সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে মেনে নিল এবং নিজেদের মনগড়া আইন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করল, তখনই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে গেল। সেই অন্ধকার সমাজ থেকে বেরিয়ে এলেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু ওমর, খালেদ, তারেক, মূসা বিন নুছাইরের মতো বিশ্বসেরা ব্যক্তিবর্গ। বর্তমান গণতান্ত্রিক বা কম্যুনিষ্ট বিশ্ব এই সকল মানুষের সমতুল্য একজন ব্যক্তিকেও দাঁড় করাতে পারবে কি?

এজন্যেই তো ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সে দেশের 'জাতির জনক' মিঃ গান্ধী ভারতের নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা দেশে শান্তি চাও, তাহ'লে ওমরের শাসনব্যবস্থা কায়েম কর'। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ' বলেছিলেন If a man like Muhammad are to assume the dictatorship of the modern world, he alone could bring the much needed peace and happiness. 'যদি মুহাম্মাদের মত একজন মানুষ আজকের আধুনিক বিশ্বের ডিক্টেটর হ'তেন, তাহ'লে তিনি একাই বহু আকাংখিত শান্তি ও সুখ এনে দিতে পারতেন'। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহভীরু ব্যক্তির কাছেই অন্য মানুষের জান, মাল ও ইযযত সবকিছু নিরাপদ। যার অভাবে আজকের বিশ্বসমাজ জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। একজন মানুষকে সূদের ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে সাময়িক সুবিধা দানের বিনিময়ে তাকে দুনিয়াতে ঋণের জালে আবদ্ধ করা এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানানোর চাইতে তাকে আল্লাহভীরু বানানো কি দীর্ঘ মেয়াদী ফলদানকারী নয়? নফসের পূজারী ব্যক্তি স্বীয় নফসের খায়েশ মিটাতে অন্যের উপরে যুলুম করে। কিন্তু আল্লাহভীরু ব্যক্তি নিজের চাহিদার উপরে অন্যের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের বাপ-দাদারা গরীব ছিলেন। কিন্তু তাদের মনে সুখ ছিল। তারা মনখুলে হাসতেন। উদারমনে মেহমানদারি করতেন। অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগী হ'তেন। কিন্তু আমরা আজ 'এসি' ঘরে বাস করেও সুখ পাইনা। মনের পবিত্রতা হারিয়ে গেছে। সেখানে বাসা বেঁধেছে হিংসা-বিদ্বেষ, কুটিলতা ও কৃত্রিমতা। মন খুলে হাসির কথা আমরা ভুলে গেছি। মেহমান দেখলে পালিয়ে বাঁচি। গ্রামের কোন আত্মীয় এমনকি পিতা-মাতাও তার শহুরে সন্তানের কাছে আসতে চায় না। এই অশান্তিময় বিলাসিতার চাইতে শান্তিময় কুঁড়ে ঘর কি উত্তম নয়? আধুনিক কোন তন্ত্র-মন্ত্র কি পেরেছে মানুষকে সেই সুখ দিতে? একমাত্র আল্লাহভীরু মানুষই পারে নিজের আরাম-আয়েশকে অন্যের জন্য বিসর্জন দিতে, পারে নিজের উপরে অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে।

(১) মাদায়েন বিজিত হয়েছে। সাসানী সম্রাটদের বহুমূল্য গণীমতের মাল জমা হচ্ছে। এমন সময় জনৈক নওমুসলিম সাসানী সম্রাটের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুগুলি এনে জমাকারীর নিকটে জমা দিল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জমাকারী জিজ্ঞেস করলেন, এত মূল্যবান বস্তু তুমি নিয়ে এলে। এ থেকে তুমি নিজের জন্য কিছু রাখনি? লোকটি বলল, মুসলমান হওয়ার আগের দিন (যখন খৃষ্টান ছিলাম) যদি জিজ্ঞেস করতেন, তাহ'লে

এসব মালের কোন সন্ধানই আপনারা পেতেন না। কিন্তু আজ আমি ঈমানের কলেমা পড়েছি। তাই আর আমার দ্বারা অন্যায় কিছু সম্ভব নয়। এসব এখন আল্লাহর মাল। তাই আল্লাহর ভান্ডারে জমা দিলাম। তিনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু দেখছেন'। সবাই তার নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি অস্বীকার করে বললেন, নাম বললে আপনারা আমার প্রশংসা করবেন। কিন্তু আমি কারু প্রশংসা চাইনা, স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই। আমি প্রাণভরে কেবল তাঁরই প্রশংসা করি, যিনি দয়া করে আমাকে ঈমানী সম্পদ দান করেছেন'। গতকাল যে ব্যক্তিটি ছিল নফসে আম্মারাহর পূজারী, আজকে সে ব্যক্তিটি আল্লাহর পূজারী। ফলে তার পূরা জীবনধারাটিই রাতারাতি পাল্টে গেছে। দুনিয়ার চাইতে আখেরাত তার কাছে এখন অধিকতর কাম্য হয়েছে।

(২) ভারতের সম্রাট মুহাম্মাদ বিন তুগলক জানতে পারলেন যে, জনৈক ব্যক্তির উপরে আদালতে অবিচার করা হয়েছে। তিনি যুবকটিকে দরবারে ডাকালেন। দরবার ভর্তি সভাসদগণের সম্মুখে যুবকটিকে ডেকে সব ঘটনা শুনলেন। এবারে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ হ'তে যুবকটির সম্মুখে নত হয়ে করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন। তারপর নিজের পোষাক খুলে পিঠ নগ্ন করে দিলেন ও নিজের বেতের লাঠিখানা হিন্দু যুবকটির হাতে দিয়ে বললেন, তুমি সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে মার, যেভাবে আদালতের হুকুমে তোমাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। যুবকটি আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলল। কিন্তু সম্রাট কোন কথাই শুনতে চান না। অবশেষে তাকে মারতেই হ'ল। জোরে আরো জোরে। পিঠ রক্তাক্ত হয়ে গেল। এবার যুবককে বুকে জড়িয়ে ধরে সম্রাট বললেন, হে যুবক! আমার রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মযলূমের দো'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই'। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, প্রতিশোধ নিয়েছ। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাব। হে যুবক! তুমি প্রতিশোধ নিয়ে আজ আমার সবচেয়ে বড় উপকার করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ।

(৩) ভারতব্যাপী 'বৃটিশ খেদাও' আন্দোলন শুরু হয়েছে'। ইংরেজ কর্মকর্তাদের উপরে প্রতিশোধমূলক চোরাগুপ্তা হামলা হচ্ছে। তাদের জানমাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা নেই। হঠাৎ একদিন এক ইংরেজ যুবতী ছুটে এসে আশ্রয় চাইল দিল্লীর সর্বজনশ্রেদ্ধেয় আহলেহাদীছ আলেম সাইয়িদ নাযীর হুসায়েন দেহলভীর কাছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন। মেয়ের মত তাকে মাসাধিককাল বাসায় লুকিয়ে রাখলেন। অতঃপর সুযোগ বুঝে তাকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকটে পৌঁছে দিলেন। কৃতজ্ঞ মেয়েটি চোখের পানি ফেলতে লাগল। মাওলানা বললেন, মা! তুমি আমি সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা সবাই তাঁর পরিবার। তাঁর পরিবারের একজন সদস্যা হিসাবে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। বিনিময়ে দুনিয়ায় কিছু চাই না। স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই। এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইসলামী বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে। এঁদের হাতেই সত্যিকারের ন্যায় ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, এরূপ একজন অতুলনীয় মানুষকেও বৃটিশ সরকার একবছর কারাবন্দী রেখেছিল আহলেহাদীছ নেতা হবার অপরাধে। তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল দু'বার।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ এইসব আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বসানোর উপায় কি? এঁরা তো কখনোই নেতৃত্ব চাইবেন না বা নির্বাচনেও প্রার্থী হবেন না। এর জবাব এই যে, প্রথমে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্বের বাস্তব ও ব্যবহারিক পার্থক্য, ইসলামী খেলাফত এবং নিজেদের মনগড়া আইন ভিত্তিক শাসন

ব্যবস্থার পার্থক্য জনগণকে সুন্দরভাবে বুঝাতে হবে। এ দু'টি ব্যবস্থার দুনিয়াবী ও পরকালীন লাভ-লোকসান সম্পর্কে তাদেরকে সম্যক ধরণা দিতে হবে এবং ইসলামী খেলাফতের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হবে। সংগঠিত জনমতই জনশক্তিতে পরিণত হবে এবং তার মাধ্যমে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি সবই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখনই জনগণ এই ধরনের পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণকে নেতৃত্বে বসাতে পারবে। আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাথায় মানুষের অন্তর আবর্তিত হয়। তিনি ইচ্ছা করলে দ্রুত জনগণের অন্তর সমূহ ঘুরিয়ে দিতে পারেন। মুমিন ব্যক্তি কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। মুমিনের দায়িত্ব হ'ল নবীগণের দেখানো পথে দাওয়াতের ময়দানে কাজ করে যাওয়া। সফলতা আল্লাহর হাতে।

দ্রুত দুনিয়াবী ফল না পেয়ে অনেকে আধুনিক জাহেলী মতবাদ সমূহের সাথে আপোষ করার চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। অনেকে চরমপন্থা বেছে নিতে চান। কিন্তু এসব চিন্তাধারার পক্ষে ইসলামের কোন অনুমোদন নেই। কালো টাকা ও পেশীশক্তির মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা হ'তে বিরত রাখার জন্য ইসলাম দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচনের বিধান দিয়েছে। জনগণ ইসলামী শর্তাবলী অক্ষুণ্ণ রেখে দেশের মাত্র একজন শাসক বা খলীফা নির্বাচন করবে। ইসলামী নীতির আলোকে নেতৃত্ব নির্বাচনের ও জনমত সংগ্রহের সর্বোত্তম পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে ভাবতে হবে। (এ বিষয়ে মাননীয় লেখকের 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বইটি পাঠ করুন- সম্পাদক)। নির্বাচিত নেতা কত ভোট পেলেন না পেলেন, এগুলি বিষয় নির্বাচন কমিশন গোপন রাখবেন। অতঃপর নির্বাচিত খলীফা সৎ যোগ্য ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করবেন। যারা তখন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট নিয়োগ দিবেন। যারা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিবেন। খলীফা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হবেন। তিনিই আল্লাহর কাছে ও জনগণের কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকবেন।

রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন সভা- এই তিনটির মধ্যে প্রথম দু'টি প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টের হাতে রয়েছে এবং তৃতীয়টি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, এম,পি হিসাবে। ইসলামী ব্যবস্থায় উক্ত দু'টি সহ তৃতীয়টি অর্থাৎ আইন সভার সদস্যগণ খলীফা কর্তৃক মনোনীত হবেন। এটাই হ'ল উত্তম ব্যবস্থা। কেননা আইন সভার জন্য সৎ, নির্লোভ, আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করা জনগণের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান মাত্র ১০০ জন সৎ ও যোগ্য লোক বাছাই করতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত দু'জন বরেন্য ব্যক্তিকে। অনেকদিন পর গলদঘর্ম হ'য়ে তাঁরা মাত্র ১০ জনের তালিকা পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাদের মধ্যে পাঁচজন ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের জন্য ১৫ জন সৎ ও নিরপেক্ষ সদস্য বাছাই করতে গিয়ে কেমন হিমশিম খেয়েছিলেন, তার তিক্ত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ গ্রন্থটি পাঠ করলে বুঝা যায়। অতএব নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি অতটা সহজ নয়, যতটা মনে করা হয়। আর সেকারণেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে যাবতীয় দলীয় বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে

http://www.healthprose.org/ http://www.handlestresshelp.com/
https://www.hillsfarmacy.com/
http://www.ambienonlinebuycheap.com/